Vol. 49 | No. 1 | 2011

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত : একটি পর্যালোচনা

Volume	49
Issue	1
Year	2011
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	পারভীন আক্তার জেমী
Published online	October 1, 2011
DOI	10.62328/sp.v49i1.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v49i1.7
Pages	১১৫-১২৫
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত : একটি পর্যালোচনা

Check for updates

পারভীন আক্তার জেমী*

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) আবির্ভাবের পূর্ববর্তী সময়টা ছিল যুগসংকট প্রধান। ১৭৫৭ সালে পলাশির প্রান্তরে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের মাধ্যমে এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা গ্রহণের ফলে ভারতবর্ষের চিরায়ত শাসন ব্যবস্থার মূল আন্দোলিত হয়। সে-সময়ে ভারতবর্ষ এ ধাক্কাটা সহজে সামলে নিতে পারেনি। সমাজ ছিল অন্তর্দ্বন্দ্বে দোদুল্যমান। শিক্ষিত জনমানসও ছিল দ্বিধাগ্রস্ত। এমনকি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুক্তিবিদ এবং বুদ্ধিজীবী রামমোহন রায়ও (১৭৭৪-১৮৩৩) এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। রামমোহনের কথা বাদ দিলে বঙ্কিমচন্দ্রকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ মনীষী বলা যায়। তিনি তাঁর চিন্তনক্রিয়াকে শুধু সাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি; প্রসারিত করেছেন জাতিগঠনে, ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজগঠনে, ইতিহাস রচনার অনুপ্রেরণায়, নৈতিকতার মানোন্নয়নে, শিক্ষার প্রসারে, সর্বোপরি স্বদেশপ্রেমে। বঙ্কিম তাঁর সচেতন দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা সে সময়ের যুগসংকটের স্বরূপকে উপলব্ধি করেছেন এবং কীভাবে সে সংকট থেকে মানুষকে, সমাজকে রক্ষা করা যায় তার উপায় অনুসন্ধান করেছেন। তাঁর স্বচ্ছ চিন্তায় ধরা পড়েছিল যুগসংকট উত্তরণের উপায়। তিনি তীক্ষ্ণ যুক্তিবোধ, দূরদৃষ্টি এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞান দ্বারা বিভিন্ন বিষয় বিশ্লেষণ করেছেন। তারই প্রকাশ ঘটিয়েছেন বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকায়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিভাকে চিহ্নিত করার অকৃত্রিম জায়গা তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্য। প্রবন্ধ ছিল তাঁর চিন্তা ও মননের বাহন। বিষয় ও ভাষারীতির দিক থেকে অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ সমৃদ্ধ করলেও বঙ্কিমই প্রথম প্রবন্ধকে প্রথম শ্রেণির শিল্পকলার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে লিখেছেন :

> একদিন আমাদের বঙ্গভাষা কেবল একতারা যন্ত্রের মতো এক তারে বাঁধা ছিল, কেবল সহজ সুরে ধর্ম সংকীর্তন করিবার উপযোগী ছিল; বঙ্কিম স্বহস্তে তাহাতে এক-একটি করিয়া তার চড়াইয়া আজ তাহাকে বীণাযন্ত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন।[১]

বিদ্যাসাগরের পথ ধরেই বঙ্কিম বাংলা গদ্য লেখা শুরু করেন। গদ্য নির্ভেজাল চিন্তার ভাষা। নির্মোহ বুদ্ধি, বাস্তব প্রত্যয় এবং যৌক্তিক পারম্পর্য প্রবন্ধের প্রধান লক্ষণ হলেও লঘু কৌতুক বিষয় অবলম্বন করেও অনেকে প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

বঙ্কিম উপন্যাস-স্রষ্টা হিসেবে সমধিক খ্যাতি অর্জন করলেও তাঁর উপন্যাসের তুলনায় প্রবন্ধের সংখ্যা বেশি। প্রবন্ধে বঙ্কিমের ভাষা অনেক বেশি পরিণত। উপন্যাস ছাড়া বঙ্কিমের গদ্য রচনাবলিকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায় —

*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

ক. ব্যঙ্গাত্মক ও সরস
খ. জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সমালোচনা-বিষয়ক
গ. দর্শন ও শাস্ত্রচর্চা-বিষয়ক

প্রথম শ্রেণির অন্তর্গত প্রবন্ধে আছে — *লোকরহস্য*, *কমলাকান্ত* এবং 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত'। 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' (১২৮৭) প্রথম বের হয়েছিল 'বঙ্গদর্শনে'।

বঙ্কিম প্রথম দেখিয়েছেন যে, হাসির আলোকে কান্নার কালো মেঘ লুক্কায়িত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, নির্মল, শুভ্র, সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্বপ্রথম বঙ্গ সাহিত্যে আনয়ন করেন।

বঙ্কিমের প্রবন্ধের হাস্যরস জীবনরসের সঙ্গে অঙ্গীভূত। তাঁরই রূপায়ণ ঘটেছে 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিতে'। উক্ত প্রবন্ধ পর্যালোচনায় প্রথমেই এর কাহিনীর ধারাবাহিকতায় মূল্যায়ন প্রয়োজন।

বঙ্কিম শুরুতেই সঠিক তথ্য সংবলিত বাংলার ইতিহাস না থাকার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন :

> ইতিহাস এরূপ অনেক প্রকার বদমাইশি করিয়া থাকে। এদেশে ইতিহাসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। নচেৎ উচিৎ ব্যবস্থা করা যাইত। (প্রথম পরিচ্ছেদ)

বাঙালির ইতিহাস লিপিবদ্ধ না থাকার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের যে তীব্র ক্ষোভ ছিল তা তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধের ভেতর দিয়েই প্রকাশিত। 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

> বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে, তাহা ইতিহাস নয়, তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাঙ্গালার বিদেশী বিধর্ম্মী অসার পরপীড়কদিগের জীবনচরিতমাত্র। বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে?[২]

তিনি 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রবন্ধেও বাঙালির ইতিহাস না থাকার কারণে উষ্মা প্রকাশ করেছেন এভাবে :

> সাহেবরা যদি পাখী মারিতে যান তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়, কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাস নাই। গ্রীন্‌লন্ডের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। মাওরি জাতির ইতিহাসও আছে, কিন্তু যে দেশে গৌড় তাম্রলিপ্তি, সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল, যেখানে নৈষধচরিত গীতগোবিন্দ লিখিত হইয়াছে, যে দেশ উদয়নাচার্য্য, রঘুনাথ শিরোমণি ও চৈতন্যদেবের জন্মভূমি, সে দেশের ইতিহাস নাই। মার্শম্যান, স্টুয়ার্ট প্রভৃতি প্রণীত পুস্তকগুলিকে আমরা সাধ করিয়া ইতিহাস বলি; সে কেবল সাধ-পুরাণ মাত্র।[৩]

প্রথম পরিচ্ছেদেই মুচিরাম গুড়ের জীবনবৃত্তান্ত তুলে ধরা হয়েছে। সমাজে প্রচলিত বংশ মর্যাদার বিষয়টি এসেছে। নামকরণের মধ্যে হাস্যরসের পাশাপাশি কটাক্ষ করা হয়েছে। মুচিরামের নামকরণেই হাস্যরসের পরিচয় মেলে। লেখক যে সমাজ সমালোচনায় মুখর তা মুচিরাম গুড়ের নামকরণের বিষয়টিতে স্পষ্ট। নামকরণের বর্ণনাটি নিম্নরূপ :

> নামকরণ হইল মুচিরাম। এত নগেন্দ্র গজেন্দ্র চন্দ্রভূষণ বিধুভূষণ থাকিতে তাঁহার মুচিরাম নাম হইল কেন, তাহা আমি সবিশেষ জানি না। তবে দুষ্ট লোকে বলিত যে, যশোদা দেবীর যৌবনকালে কোন কালো-কালো কোঁকড়াচুল নধরশরীর মুচিরাম দাস নামা কৈবর্ত্তপুত্র তাঁহার নয়নপথের পথিক হইয়াছিল, সেই অবধি মুচিরাম নামটি যশোদার কানে মিষ্ট লাগিত। (১ম পরিচ্ছেদ)

সে সমাজে ব্রাহ্মণরাও যে মূর্খ ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য ছিল সমাজে। কিন্তু সাফলরাম গুড়ের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যশোদা দেবী দুরবস্থায় পতিত হয়। একমাত্র ভরসা ছিল মুচিরাম। মায়ের অতি আদরের সন্তানের কীভাবে বাল্যকালেই চারিত্রিক স্খলন ঘটে তা দেখতে পাই মুচিরামের চুরি বিদ্যার পারদর্শিতায়। তারপরও বলবৎ থাকে প্রবল মাতৃস্নেহ। সন্তানের প্রতি মঙ্গল কামনায় যশোদা দেবী হারাণ অধিকারীর কাছে মুচিরামকে সমর্পণ করে।

চিরায়ত মাতৃহৃদয়ের কামনা, তার সন্তান যেন ভালো থাকে। পাশাপাশি দেখা যায়, মুচিরামের ভেতর দায়িত্বজ্ঞানের অভাব। স্বামীহারা নারী, সমাজে কতটা অসহায় তা যশোদা দেবীকে দেখলেই দৃষ্টিগোচর হয়। মুচিরামের সুকণ্ঠের কথা ভেবে হারাণ অধিকারী এই মর্মে তার ভবিষ্যতের স্বপ্ন রচনা করেছিলেন যে, তার (মুচিরামের) জোরে সে অধিক টাকার মালিক হবে। কিন্তু অচিরেই সে স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায়। মুচিরাম যাত্রাদলের কোনো পাঠ ঠিকমতো করতে পারত না। তাই বেত্রাঘাতে অতিষ্ঠ হয়ে হারাণ অধিকারীর কাছ থেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু গন্তব্য তার জানা ছিল না। ক্ষুধার তাড়নায় তার মনে হয়েছিল, কেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেল না। এখানেই লেখকের কটাক্ষ। দাসত্বের প্রতি ক্ষোভ এবং সেই সাথে ইতিহাসের প্রতি কটাক্ষ প্রকাশ করেছেন। সেন রাজাদের পরাজয়ের ইতিহাসের প্রতি ব্যঙ্গের চাবুক ছুঁড়েছেন :

> তোমার গোষ্ঠীর বাপ চৌদ্দপুরুষের বুড়া সেন রাজার আমল হইতে কেবল পিঠ পাতিয়া দিয়াই আসিতেছে। .... মুচিরামরা পিঠ পাতিয়াই দেয়। (৩য় পরিচ্ছেদ)

সেন রাজার পরাজয়ের ইতিহাস বঙ্কিম মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারেননি। 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' প্রবন্ধে তাই তিনি বলেছেন :

> বাস্তবিক সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজি যে বাঙ্গালা জয় করেন নাই, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। সপ্তদশ অশ্বারোহী দূরে থাকুক, বখ্‌তিয়ার খিলিজি বহুতর সৈন্য লইয়া বাঙ্গালা সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে পারে নাই। বখ্‌তিয়ার খিলিজির পর সেনবংশীয় রাজগণ পূর্ব্ববাঙ্গালায় বিরাজ করিয়া অর্দ্ধেক বাঙ্গালা শাসন করিয়া আসিলেন। তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। উত্তরবাঙ্গালা, দক্ষিণবাঙ্গালা, কোন অংশই বখ্‌তিয়ার খিলিজি জয় করিতে পারে নাই। ... সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখতিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল এ কথা যে বাঙ্গালীতে বিশ্বাস করে, সে কুলাঙ্গার।[৪]

চতুর্থ পরিচ্ছেদে আমরা ঈশানবাবুর মতো চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই। ঈশানবাবুর মতো দয়ালু, নীতিবান চরিত্র আঁকতে গিয়ে লেখক বাঙালির নৈতিক অবক্ষয়ের প্রতি খোঁচা দিয়েছেন।

> বাঙ্গালাদেশে মনুষ্যত্ব বেতনের ওজনে নির্ণীত হয়। (৪র্থ পরিচ্ছেদ)

ঈশানবাবু বিদ্যানুরাগী। তাই তিনি মুচিরামকেও বিদ্যাচর্চায় পারদর্শী করতে চেয়েছেন। আবাল্য স্বার্থপর মুচিরাম সেদিকে সামান্য মনোযোগ দিতে আগ্রহী হয়নি। এমনকি মাকে ছেড়ে আসার

পর একবারও মায়ের খোঁজ নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেনি। শুধুমাত্র স্বার্থের প্রয়োজনে (ভোজনের সময়) মাকে মনে পড়ত। অন্য সময় তার কোনো সাক্ষাৎ আমরা পাইনি।

সে সময়ে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন যে শুরু তা পঞ্চম পরিচ্ছেদে এসে দেখতে পাই। ঈশানবাবু মুচিরামকে বিদ্যাশিক্ষার আশায় ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। কিন্তু মুচিরামকে দিয়ে লেখাপড়া কিছুই হলো না। শেষ পর্যন্ত স্কুল থেকে ছাড়িয়ে ঈশানবাবু ১০ টাকা বেতনের মুহুরিগিরি নিয়ে দিলেন। কিন্তু মুচিরামের অর্থলিপ্সু মন প্রথম দিনেই হুকুমের চোরাও নকল করে আটগণ্ডা পয়সা হাত করল এবং সন্ধ্যায় তা প্রতিবাসিনীর পাদপদ্মে উৎসর্গ করল। তখনকার সমাজে যে এর প্রচলন ছিল তার উল্লেখ পাই শিবনাথ শাস্ত্রীর *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ* গ্রন্থে। উক্ত গ্রন্থে বলা হয়েছে :

> তৎকালে বিদেশে পরিবার লইয়া যাইবার প্রথা অপ্রচলিত থাকাতে এবং পরস্ত্রীগমন নিন্দিত বা বিশেষ পাপজনক না থাকাতে প্রায় সকল আমলা, উকীল বা মোক্তারের এক একটি উপপত্নী আবশ্যক হইত। সুতরাং তাহাদের বাসস্থানের সন্নিহিত স্থানে স্থানে গণিকালয় সংস্থাপিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে গ্রীসদেশে যেমন পণ্ডিত সকলও বেশ্যালয়ে একত্রিত হইয়া সদালাপ করিতেন। সেইরূপ প্রথা এখানেও প্রচলিত হইয়া উঠিল।[৫]

সমাজে তখন টাকার বিনিময়ে যে সত্য/মিথ্যা নিরূপিত হতো তা মুচিরামের চরিত্র থেকেও প্রমাণিত। অর্থ উপার্জনে মুচিরাম ছিল নির্লজ্জ। কীভাবে অধিক অর্থ উপার্জন করা যায় সর্বক্ষণ সে ব্যাপারেই তার ক্ষমতা ও বুদ্ধি প্রয়োগ করতে লাগল। শিবনাথ শাস্ত্রী এ প্রসঙ্গে তাঁর গ্রন্থে বলেছেন :

> তখন মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, উৎকোচ, জাল, জুয়াচুরি প্রভৃতির দ্বারা অর্থ সঞ্চায় করিয়া ধনী হওয়া কিছুই লজ্জার বিষয় ছিল না। বরং কোনও সুহৃদগোষ্ঠীতে পাঁচজন লোক একত্রে বসিলে এরূপ ব্যক্তিদিগের কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা হইত। এই সময়ে সহরের সম্পন্ন মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থদিগের গৃহে 'বাবু' নামে এক শ্রেণীর মানুষ দেখা দিয়াছিল। তাহারা পারসী ও স্বল্প ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন ধর্ম্মে আস্থাবিহীন হইয়া ভোগসুখেই দিন কাটাইত। ইহাদের বহিরাকৃতি কি কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিব? মুখে, ভ্রূ পার্শ্বে ও ত্রেতোলে নৈশ অত্যাচারের চিহ্নস্বরূপ কালিমা রেখা, শিরে তরঙ্গয়িত বাউরি চুল, দাঁতে মিশি, পরিধানের ফিন্‌ফিনে কালাপেড়ে ধূতি, অঙ্গে উৎকৃষ্ট মসলিন বা কেমরিকের বেনিয়ান, গলদেশে উত্তমরূপে চুনট করা উড়ানী ও পায়ে পুরু বলন সমন্বিত চিনের বাড়ীর জুতা। এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার, এসরাজ, বীন প্রভৃতি বাজাইয়া কবি, হাপ-আখড়াই, পাঁচালী প্রভৃতি শুনিয়া, রাত্রে বারাঙ্গনাদিগের আলয়ে আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদ করিয়া কাল কাটাইত এবং খড়দহর মেলা ও মহেশের স্নানযাত্রা প্রভৃতির সময়ে কলিকাতা হইতে লইয়া দলে দলে নৌকাযোগে আমোদ করিতে যাইত।[৬]

সে-সময় ওই সমাজের প্রতিনিধি মুচিরামের অর্থবিত্তের সাথে সাথে পোশাকেও বৈচিত্র্য এল। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন :

> বর্ণ জাপান লেদার ছাড়িয়া দিল্লীর নাগরায় পৌঁছিল। পরিচ্ছদের বৈচিত্র্য জন্মিতে লাগিল — শাদা, কালো, নীল, জরদা, রাঙ্গা, গোলাপী প্রভৃতি নানা বর্ণের বস্ত্রে মুচিরাম সর্ব্বদা রঞ্জিত। রাত্রি দিন মাথায় তেড়ি কাটা, অধরে তাম্বুলের রাগ এবং কণ্ঠে নিধুর টপ্পা। (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

অকর্মণ্য মুচিরামের ভাগ্য সবসময় সুপ্রসন্ন ছিল। গঙ্গারাম সাহেবের মতো অলস, অকর্মণ্য, দায়িত্বহীন একজন তার সাহেব হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। গঙ্গারাম সাহেবদের কর্তব্যহীনতায় মুচিরামদের মতো লোভী, মূর্খ লোকরা উত্তরোত্তর নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের সুযোগ পেয়েছে। গঙ্গারাম সাহেবরা শুধু দায়িত্বহীন ও কর্তব্যবিমুখই ছিলেন না, তারা তোষামোদিও পছন্দ করতেন। মুচিরামের গুণের মধ্যে ছিল সে মিষ্ট কথায় পারদর্শী। আর হোম সাহেব ছিলেন মিষ্ট কথায় বশ। এখানে স্মরণীয় যে, ১৮৪৩ সাল হতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে ভারতীয় নিয়োগের নীতি প্রবর্তিত হয়, এবং আরো পরে উচ্চ পদে নিয়োগ প্রার্থীদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রচলন ঘটে। বঙ্কিম নিজে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেকটর পদে নিয়োগ লাভ করেন। সেখানে মুচিরামের মতো মূর্খ, অশিক্ষিত লোক কেবল তোষামোদ ও মিষ্ট কথার জোরে এসব গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছে। ইংরেজ সরকারের নিয়োগের ক্ষেত্রে এ বৈষম্য বঙ্কিমকে নাড়া দিয়েছিল। তাই তিনি তাদেরই প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্ররূপে মুচিরামকে চিহ্নিত করেছেন।

মুচিরামের সৌভাগ্য সবসময়ই ছিল দৈব নিয়ন্ত্রিত। তাই পেস্কারি পদ চালানোর মতো যোগ্যতা না থাকলেও ভজগোবিন্দের মতো অনুগত, নিষ্ঠাবান ও সৎ কর্মচারীর বদৌলতে মুচিরাম তার স্বার্থ উদ্ধারে সক্ষম হয়েছে। ভজগোবিন্দের পরামর্শে মুচিরাম বেনামিতে সম্পত্তি ক্রয় করতে শুরু করেন। লেখকের ভাষায় :

স্ত্রীর নামে বিষয় করাই বেনামীর শ্রেষ্ঠ। (অষ্টম পরিচ্ছেদ)

'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিতে' দ্বিতীয় যে নারীচরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় সে ভদ্রকালী। মুচিরামের স্ত্রী। ভজগোবিন্দের সহোদরা। তথাকথিত নারীদের প্রতিনিধিরূপেই ভদ্রকালী চিহ্নিত। নারীর জগৎ শুধু শাড়ি-গহনা এবং তা লোক দেখানোর জন্য — এ মানসিকতার ধারক ভদ্রকালী। এর বাইরে ভদ্রকালীর কোনো পরিচয় পাওয়া যায়নি।

রীড সাহেব ন্যায়বান, বিচক্ষণ হওয়া সত্ত্বেও মুচিরামকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে পারেননি। বরং তিনি চেয়েছিলেন মুচিরামকে সংশোধন করতে। প্রতিকাররূপে মুচিরামকে তিনি ডেপুটি কালেক্টর পদে নিযুক্ত করলেন। উল্লেখ্য, বঙ্কিম ঊনবিংশ শতাব্দীর অবক্ষয়ের পটভূমিকায় জাতির চরিত্র সংশোধনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এর জন্য তিনি লেখনীর দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তিনি নিজেও ব্যক্তিগত জীবনে একজন সৎ, নীতিবান, ন্যায়পরায়ণ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। তাঁর বিচারে শাস্তি পেয়ে অনেক চোরও সংশোধিত হয়েছে।

মুচিরামকে চাটগাঁ বদলি করাতে মুচিরাম চাকরি থেকে ইস্তফা দিলেন এবং কলকাতাতে বাড়ি কিনলেন। কলকাতাতে একজন প্রথম শ্রেণির প্রতারক রামচন্দ্রবাবুর সাথে মুচিরামের সখ্য গড়ে ওঠে। তাকে আশ্রয় করে মুচিরাম নাগরিক জীবনযাত্রা নির্বাহে অভ্যস্ত হন। নগরের অনেকের কাছে মুচিরাম 'মাতাল জমিদার' নামে পরিচিত হন।

অরবিন্দ পোদ্দার তাঁর *বঙ্কিম-মানস* গ্রন্থে উল্লেখ করেন, "১৮৩৭ সালে জমিদারদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য জমিদার সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৪৩ সালে শিক্ষিত সম্প্রদায় 'বেঙ্গল বৃটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৮৫১ সালে দুইটি প্রতিষ্ঠানকে একত্রিত করিয়া 'বৃটিশ ইন্ডিয়া এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হয়।"[৭]

মুচিরামের মতো মূর্খও উক্ত 'বৃটিশ ইন্ডিয়া এসোসিয়েশন'-এর সদস্য হন। যেখানে বঙ্কিমের মতো ডেপুটি প্রথম চাকুরিতে নিয়োগ প্রাপ্ত হন ১৮৫৮ সালে এবং ১৮৬৩ সালের ৫ আগস্ট 'বৃটিশ ইন্ডিয়া এসোসিয়েশনে'র সদস্য হন। বঙ্কিম তাঁর চারপাশে মুচিরামদের মতো ডেপুটিদের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। এমনকি মুচিরাম 'বাঙ্গাল কৌন্সিলে'ও আসন লাভ করেছেন।

মুচিরাম অর্থকষ্টে পতিত হলে ভজগোবিন্দের পরামর্শে জমিদারির তালুকে গেলেন অর্থ সংগ্রহ করতে। জমিদারেরা ছিল সরকারের এবং কোম্পানির রাজস্ব আদায়কারী এজেন্ট। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুযায়ী স্থির হয় যে, জমিদাররা তাদের আদায়কৃত রাজস্বের নয় দশমাংশ কোম্পানির কাছে হস্তান্তর করবে। বদরুদ্দীন উমর তাঁর *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন :

> বছরের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট রাজস্ব কোম্পানীর ঘরে জমা দিলে বংশানুক্রমে জমিদাররা জমির স্বত্বাধিকারী থাকবেন এবং ভবিষ্যতে জমির মূল্য যাই হোক তাতে তাঁদের সাথে কোম্পানীর বন্দোবস্তের কোন পরিবর্তন হবে না। সে বন্দোবস্ত অপরিবর্তনীয় এবং চিরস্থায়ী।[৮]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরবর্তী পর্যায়ে দেখা গেল যে, জমিদারদের অধিকাংশই অপদার্থ। তারা নিজেদের এলাকার কোনো খোঁজ-খবর রাখত না। যেমন, মুচিরামেরও জমিদারির সাথে কোনো সংযোগ ছিল না। শুধু টাকার প্রয়োজনেই তালুকে যাওয়া। বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন :

> সমগ্র উনিশ শতক এবং বিশ শতকের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ইতিহাসে এই অতিরিক্ত মধ্যস্বত্বভোগীদের শোষণ ও নির্যাতনের মাত্রা উত্তরোত্তরভাবে বৃদ্ধি লাভ করে এদেশে নিয়মিতভাবে খাদ্যসঙ্কট, দুর্ভিক্ষ, মহামারী সৃষ্টি করেছে এবং কৃষকদেরকে জমি থেকে উত্তরোত্তর বর্ধিত হারে উচ্ছেদ করে তাদেরকে পরিণত করেছে ভূমিহীন কৃষক ও গ্রাম্য দিনমজুর শ্রেণীতে।[৯]

তিনি আরো বলেন : এই অবস্থা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং বৃটিশ ভারতীয় সরকারেরই সৃষ্টি।[১০]

উনিশ শতকে ভারতীয় প্রতিক্রিয়ার অন্যতম প্রধান প্রতিনিধি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সপক্ষে নিম্নলিখিত বক্তব্য হাজির করেন :

> চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধ্বংসে বঙ্গসমাজের ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি। বিশেষ যে বন্দোবস্তে ইংরাজেরা সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া চিরস্থায়ী

> করিয়াছেন, তাহার ধ্বংস করিয়া তাঁহারা এই ভারতমণ্ডলে মিথ্যাচারী বলিয়া পরিচিত হয়েন, প্রজাবর্গের চিরকালের অবিশ্বাসভাজন হয়েন, এ কুপরামর্শ আমরা ইংরেজদিগকে দিই না। যে দিন ইংরাজের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইব, সমাজের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইব, সেই দিন সে পরামর্শ দিব।[১১]

উক্ত প্রবন্ধে বঙ্কিম জমিদারদের সুষ্ঠুভাবে শাসন করার জন্যে ব্রিটিশ ভারতীয় সরকারকে পরামর্শ দিতে গিয়ে বলেন :

> যদি তাঁহারা কুচরিত্র জমীদারগণকে শাসিত করিতে পারেন, তবে দেশের যে মঙ্গল সিদ্ধ হইবে, তজ্জন্য তাঁহাদিগের মাহাত্ম্য অনন্ত কাল পর্য্যন্ত ইতিহাসে কীর্ত্তিত হইবে। এবং তাঁহাদিগের দেশ উচ্চতর সভ্যতার পদবীতে আরোহণ করিবে।[১২]

কিন্তু মুচিরামের মতো জমিদারেরা জমিদারি সংক্রান্ত কোনো কিছুই বুঝত না। নিজেদের জমিদারি দেখাশোনার জন্য তাদের অন্য একটি শ্রেণির উপর নির্ভর করতে হয়েছে। এই নির্ভরতার ফলে তখনকার সমাজে মধ্যস্বত্বভোগী নামে নতুন একটি শ্রেণি জন্ম লাভ করেছে।

এই মধ্যস্বত্বভোগীদের বর্ণনায় মুনতাসীর মামুন তাঁর *উনিশ শতকে পূর্ব বঙ্গের সমাজ* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন :

> মধ্যস্বত্বভোগীর মধ্যে জমিদারীর আকৃতি বা অর্থের তারতম্য থাকলেও তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল দু'টি। এক, জমির ওপর ছিলেন তারা নির্ভরশীল কিন্তু জমির সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। এবং দুই, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিলেন তিনি নিজ জমিদারীতে অনুপস্থিত।[১৩]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থক বঙ্কিম তাঁর 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে লিখেছেন :

> বাঙ্গালী কৃষকের শত্রু বাঙ্গালী ভূস্বামী। ব্যাঘ্রাদি বৃহজ্জন্তু, ছাগাদি ক্ষুদ্র জন্তুগণকে ভক্ষণ করে; রোহিতাদি বৃহৎ মৎস্য, সফরীদিগকে ভক্ষণ করে; জমীদার নামক বড় মানুষ, কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে।[১৪]

ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধি ম্যাজিস্ট্রেট কালেকটর মীন্ওয়েল দুর্ভিক্ষ তদারকিতে বের হয়ে মুচিরামের তালুকে প্রবেশ করলেন। মীন্ওয়েল ভাষা জ্ঞানের সমস্যা, কৃষকের অজ্ঞতা এবং সর্বোপরি মুচিরামের সুপ্রসন্ন ভাগ্যের কারণে মুচিরামের পক্ষে রিপোর্ট করেন। অজ্ঞ, মূর্খ, লোভী মুচিরাম পেয়ে গেলেন রাজা মুচিরাম রায় বাহাদুর খেতাব। অথচ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চাকুরির ৩৪ বছর পর 'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হন ১৮৯২ সালে। এটি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম সরকারি খেতাব। মুচিরামের 'রায় বাহাদুর' খেতাব অর্জন আর বঙ্কিমের মতো বিজ্ঞ, জ্ঞানীর খেতাব অর্জনে বিস্তর ব্যবধান।

'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' আসলে কোন ধরনের রচনা? এ বিষয়ে সুবোধচন্দ্র সেন গুপ্ত বলেছেন :

> মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত শুধু ইতিহাসই নহে ইহা জটিল উপন্যাসও বটে। এই জীবন কাহিনীতে নানা ঘটনার সম্মেলন হইয়াছে। নানা শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় মুচিরামের ভাগ্য নির্ণীত হইয়াছে।

অজিত কুমার ঘোষ তাঁর *বঙ্গ সাহিত্যে হাস্যরসের ধারায়* বলেছেন :

> 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' ব্যঙ্গরসাত্মক, তবে বইখানিতে একটি অবিচ্ছিন্ন ও পরিপূর্ণ গল্পের ধারা রহিয়াছে।[১৬]

'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' পরিপূর্ণ উপন্যাস নয়। যদিও কাহিনীর ধারাবাহিকতা আছে। কিন্তু উপন্যাসের সামনে একটি লক্ষ্য থাকে যা পাত্র-পাত্রীদের মধ্য দিয়ে পূরণ করতে হয়। উপন্যাসের প্লট থাকে বিস্তৃত। ঘটনা দ্বন্দ্ব সংঘাতে পরিপূর্ণ। কিন্তু 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এখানে কাহিনীর প্রয়োজনে অনেক পাত্র-পাত্রীর সমাবেশ ঘটেছে, কিন্তু কোনো চরিত্রই তেমনভাবে বিকশিত হতে পারেনি। লেখক কাহিনী বিন্যাসের মধ্য দিয়ে যে একটি লক্ষ্যে পৌঁছবেন তার কোনো লক্ষণ পরিদৃষ্ট নয়। শুধু পাত্র-পাত্রীর মুখ দিয়ে দু-একটি সংলাপ উচ্চারিত হয়েছে যাতে এদের বৈশিষ্ট্য নিরূপিত হয়েছে। প্রতিটি চরিত্র কোনো না কোনোভাবে মুচিরামের উন্নতিকে সম্মুখে অগ্রসর করতেই সহায়ক হয়েছে। মুচিরামের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়ার পেছনে নিয়তির ভূমিকাই অনেক বেশি। কাহিনীতে দুটি নারীচরিত্র এসেছে। কিন্তু তাদের চরিত্রের কোনো বিকাশ নেই। কাহিনীতে লেখক প্রয়োজনে হাস্যরস প্রয়োগ করেছেন। কাহিনীর মূল চরিত্র মুচিরামের ভেতর কোনো দ্বন্দ্ব-প্রতিক্রিয়া কাজ করেনি। সুতরাং এটিকে উপন্যাস বলা সংগত নয়।

এমনকি একে ছোটগল্পও বলা চলে না। এখানে কাহিনী যেভাবে বিন্যস্ত হয়েছে তা ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়।

'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত'কে প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এবং একে ব্যক্তিগত প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করা চলে। কারণ ব্যক্তিগত প্রবন্ধের বিষয়বস্তু জীবনের বাস্তবানুভূতি, যা 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিতে' পুরোমাত্রায় উপস্থিত। জীবনের সীমাহীন ঘটনাবৃত্তের মধ্যে বঙ্কিম তার চারপাশে যে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের দেখেছেন তাদের কারো কারো চরিত্রের অসংগতি, অযোগ্যতা, তোষামোদপ্রবণতা মুচিরামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই তাদের জীবনে বেড়ে ওঠার কাহিনীকে বঙ্কিম হাস্যরসের সঙ্গে বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন। বঙ্কিম চারপাশের মুচিরামদের জীবনাচরণ সম্পর্কে তাঁর গভীর দর্শনকেই এ রচনায় প্রকাশ করেছেন। শ্রীশচন্দ্র দাস তাঁর *সাহিত্য সন্দর্শনে* বলেছেন :

> জীবনকে গভীর করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তি যেমন আমাদের জাতিগত দার্শনিকতার পরিচায়ক, জীবনের আনন্দ-বেদনাকে লঘুকান্ত-হাস্যোজ্জ্বল করিয়া দেখিবার অক্ষমতাও আমাদের জাতীয় জীবনের হাস্যরসের একান্ত অসদ্ভাবের পরিচায়ক।[১৭]

'ব্যক্তিগত প্রবন্ধ' সম্পর্কে তিনি বলেছেন :

> বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ আমাদের বুদ্ধি, চিন্তা বা জ্ঞানের পিপাসা মিটায়, কিন্তু ব্যক্তিগত প্রবন্ধ জ্ঞানের বিষয়কে পর্যন্ত লঘু কল্পনা প্রদীপ্ত করিয়া হাস্যোজ্জ্বলরূপে আমাদিগকে মুগ্ধ করে।[১৮]

'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিতে' দেখতে পাই লেখক জ্ঞানের বিষয়কে হাস্যোজ্জ্বলরূপেই আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। যেমন :

১. অধিকারী মহাশয়ের নিকট গলার আওয়াজ, টাকার আওয়াজে পরিণত হয়। (২য় পরিচ্ছেদ)
২. মুচিরামেরা পিঠ পাতিয়াই দেয়। (৩য় পরিচ্ছেদ)
৩. বাঙ্গালাদেশে মনুষ্যত্ব বেতনের ওজনে নির্ণীত হয়। (৪র্থ পরিচ্ছেদ)
৪. এদেশের সকল মুচিই প্রাজ্ঞ। (৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)
৫. মুচির দলই এ পৃথিবীতে চিরজয়ী। (৭ম পরিচ্ছেদ)
৬. ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়। (৮ম পরিচ্ছেদ)
৭. ডিপুটিগিরি এক প্রকার আমলাদিগের বৈধব্য — বিধবা হইলে আর মাছ খাইতে নাই। (৯ম পরিচ্ছেদ)

উক্ত বর্ণনায় হাস্যরসের ভেতরে গভীর বেদনা লুক্কায়িত। অনেক যোগ্য ব্যক্তি নানা ঘটনাচক্রে পদোন্নতি প্রাপ্ত হয় না। অথচ মুচিরামের মতো লোকেরা চালাকি, তোষণনীতির বদৌলতে উচ্চ রাজপদে সমাসীন। এই যে অসংগতি তা বেদনাদায়ক। 'মুচিরামের গুড়ের জীবনচরিতে' অনেক জায়গায় ব্যঙ্গের খোঁচা থাকলেও তার হিউমার আসলে করুণরস প্রধান। হিউমারের বর্ণনায় অজিত কুমার ঘোষ তাঁর *বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারায়* বলেছেন :

> জীবনের প্রতি সমবেদনাশীল দৃষ্টি, সকলের প্রতি এক উদার সমদর্শিতা, চিন্তাশীলতার সহিত আমোদপ্রিয়তার এক মিশ্রিত অনুভূতি এইগুলিই হইল হিউমার এর বৈশিষ্ট্য।[১৯]

সুকুমার সেন বলেছেন, "মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত বিশেষত্বহীন ব্যঙ্গ চিত্র।"[২০] করুণরস আমাদের হাসায় বটে, কিন্তু সেই হাসির অন্তরালে এক বেদনার স্রোতও প্রবাহিত। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা দেখতে পাই আবাল্য মাতৃস্নেহে লালিত মুচিরাম তার মাকে ছেড়ে আসার সময় সামান্য বেদনাও উপলব্ধি করেনি। সে শুধুই নিজস্ব চিন্তায় বিভোর ছিল। এমনকি রায় বাহাদুর খেতাব পাওয়া পর্যন্ত কোনোদিন আর আমরা তাকে তার মাকে স্মরণ করতে দেখিনি। মা বেঁচে আছে কি মরে গেছে তা জানারও প্রয়োজন বোধ করেনি। সন্তানের এ অসংগতিপূর্ণ আচরণ অবশ্যই বেদনাদায়ক। তাছাড়া ভজগোবিন্দের সঙ্গে তার আচরণও অসমঞ্জস। ভজগোবিন্দকে অবলম্বন করে মুচিরাম তার কার্যসিদ্ধি করেছে। অথচ ভজগোবিন্দের প্রয়োজনে মুচিরাম সামান্য সাহায্য করতে অপারগতা প্রকাশ করেছে।

সমাজে অধিকারী মহাশয় ও রামচন্দ্রবাবুর মতো স্বার্থপর, ধূর্ত লোকদের স্বার্থপরতার ধরন আমাদের হাসায় বটে। কিন্তু তাদের মতো লোক সমাজে আমাদের কখনোই কাম্য নয়। অপরদিকে ভজগোবিন্দ ও ঈশানবাবুর মতো নীতিবান, কর্মঠ লোক জীবনে বেশিদূর যেতে সক্ষম হয় না। এই সমাজে এই দুই বিপরীত মেরুর লোকের অবস্থান, যার ফলে মুচিরামের মতো লোকেরা উপরে ওঠার সিঁড়ি হাতিয়ে নিতে সক্ষম হয়।

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ছাড়াই মুচিরামের মতো লোকেরা উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত হয় এবং সরকারি খেতাব প্রাপ্ত হয়। যোগ্য লোকেরা অনেক ক্ষেত্রে পড়ে থাকে অনেক নিচে। যা কখনোই কাম্য নয়। এর পেছনে যেমন স্বার্থান্বেষী মহলের ভূমিকা ছিল তেমনি ছিল ইংরেজ রাজকর্মচারীদের। তারা তাদের দায়িত্বে অবহেলা করেছে। অনেক ক্ষেত্রে ছিল তাদের বিচক্ষণতার অভাব, কর্তব্যহীনতা, তোষামোদপ্রিয়তা, ভাষাজ্ঞানের সমস্যা। সব

মিলিয়ে আমরা দেখতে পাই, মুচিরামদের ভাগ্য সবসময়ই সুপ্রসন্ন। এ সব অসংগতি বঙ্কিম হাস্যরসের মাধ্যমে আমাদের সামনে তুলে ধরলেও এর ভেতর বিদ্রূপের বিষজ্বালা মিশ্রিত ছিল। নিছক হাস্যরসের জন্য বঙ্কিম মুচিরামদের মতো ডেপুটির চরিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেননি। হাস্যরসের ভেতরে যেমন ব্যঙ্গ লুক্কায়িত ছিল তেমনি তার মধ্য দিয়ে সমাজের একটি গভীর সমস্যা তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন । যেমন :

১. 'উচ্চপদ' শুনিয়া সে বলিল, "কি? ঠ্যাঙ্গ উঁচু করেছেন না কি? ভাগাড়ে দিয়া আইবা।" (৯ম অনুচ্ছেদ)
২. " আরও পদবৃদ্ধি? ছ'টা পা হবে না কি?" (১০ম অনুচ্ছেদ)
৩. "গুড়ের কলসীতে ডুবিয়ে হাত
বুঝতে নারি সার কি মাত?"(১০ম অনুচ্ছেদ)

'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত'-এর ভাষা বিশ্লেষণে দেখা যায়, এর ভাষা বঙ্কিমের 'নিজস্বরীতি'র ভাষার অন্তর্ভুক্ত। সুকুমার সেন *বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য* গ্রন্থে 'নিজস্বরীতি'র ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে :

> যে পদ্ধতিতে তৎসম ও তদ্ভব শব্দ সমান সমান ব্যবহৃত হইয়াছে এবং সমান মর্যাদাপ্রাপ্ত হইয়াছে, যাহাতে সমাসযুক্ত পদের প্রয়োগ অত্যল্প এবং যাহার বাক্য রচনা রীতি সম্পূর্ণভাবে কথ্যভাষার আদর্শানুযায়ী, এক কথায় যাহা বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্বরীতি, তাহাকেই 'নিজস্বরীতি' বলিয়াছি।[২১]

বঙ্কিম দীর্ঘ সমাসযুক্ত পদে উপমাদ্যোতক বৎ-প্রত্যয়ের পক্ষপাতী ছিলেন। যেমন : অজরামরবৎপ্রাজ্ঞ।

তৎসম শব্দের প্রয়োগ : কুরসিনী সদৃশ, লোচন চঞ্চলা, দধতি সুন্দররূপং এবং বিদ্যামর্থজ্ঞ চিন্তয়েৎ ইত্যাদি।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ যথাসম্ভব অল্প হলেও এ প্রবন্ধে তিনি প্রয়োজনানুসারে বেশ কিছু ইংরেজি শব্দ প্রয়োগ করেছেন। যেমন : Glorious British Constitution! কালেক্টর, ম্যাজিস্ট্রেট, মাই লর্ড ইত্যাদি।

ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে বঙ্কিম নিজেই বলেছেন :

> বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিৎ। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন, সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে এবং পড়িবা মাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থ গৌরব থাকিলে তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট রচনা।[২১]

বঙ্কিমের প্রবন্ধের বাক্য দীর্ঘ নয়। সমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার বেশি।

নহে, নয়-এর স্থলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে না অব্যয়ের প্রয়োগ ঘটেছে। যেমন : লেখে না।

মাত্র চৌদ্দ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' স্বল্প পরিসরে লিখিত। এ প্রবন্ধে বঙ্কিম অনেক প্রসঙ্গের অবতারণা করলেও সব প্রসঙ্গে বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করেননি।

মুচিরাম স্বার্থান্বেষী চরিত্রের প্রতীক। মুচিরামের চরিত্র আঁকতে গিয়ে বঙ্কিম আমাদের সমাজের বিভিন্ন অসংগতি, যেমন : ইংরেজ কর্মচারীর দায়িত্বহীনতা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল, মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণি, জমিদারি প্রথার প্রসঙ্গ, আইনব্যবস্থা প্রভৃতি ফুটিয়ে তুলেছেন। তাই এ প্রবন্ধে শুধু মুচিরামদের সাফল্য গাথাই নয় বরং ইংরেজ শাসননীতিরও সমালোচনা রয়েছে। যদিও এ সমালোচনা তিনি জোরালোভাবে এ প্রবন্ধে তুলে ধরেননি, তারপরও ইংরেজ কর্মচারীদের দায়িত্বহীনতা, ভাষার অজ্ঞতা, সর্বোপরি তোষামোদি কীভাবে একজন মুচিরামকে সাফল্যের শীর্ষে নিয়ে যায়, এঁকেছেন তার প্রত্যক্ষ চিত্র।

মুচিরাম গুড়ের যুগোপযোগিতা বর্তমান কালেও বিদ্যমান। বঙ্কিম ঔপনিবেশিক শাসনের কুফলস্বরূপ মুচিরামকে চিত্রিত করলেও বর্তমান কালে আমাদের চারপাশে ঘটেছে অসংখ্য মুচিরামের সমাগম। বঙ্কিম তাঁর চারপাশে যে সমস্যাকে চিহ্নিত করেছেন, বর্তমান সমাজে সে সমস্যা আরো প্রকট আকার ধারণ করেছে। সর্বক্ষেত্রে যোগ্যতার মাপকাঠিতে অযোগ্য লোকরাই এক ধাপ এগিয়ে থাকছে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পরিবেশ, সমাজ, দেশ। তোষামোদ ও ক্ষমতার কারণে যোগ্যতা ধামাচাপা পড়ছে, মুচিরামের মতো লোকেরা সমাজে প্রতিপত্তি বিস্তার করছে। সমাজ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে নীতিবোধ ও মূল্যবোধ।

তথ্যনির্দেশ

১. *আধুনিক সাহিত্য*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ভাদ্র ১৩৬৩, পৃ. ১৮
২. *বঙ্কিম রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯, নবম মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯২, পৃ. ৩৩৭
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭
৫. *রামতনুলাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ*, বিশ্বনাথ শাস্ত্রী, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা-৭৩, ২০০১, পৃ. ৩১
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
৭. *বঙ্কিম-মানস*, অরবিন্দ পোদ্দার, পুস্তক বিপনি, কলকাতা-৭০০০৯, ১৯৯৪, পৃ. ১৫
৮. *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক*, বদরুদ্দীন উমর, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১৪
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯
১১. *বঙ্কিম রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯-৩১০
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮
১৩. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ*, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, কলাভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৬, পৃ. ৯৬
১৪. *বঙ্কিম রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১
১৫. *বঙ্কিমচন্দ্র*, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, এস.সি. সরকার এন্ড সন্স প্রা: লি: কলকাতা, ১৯৭২, পৃ. ১৮৩
১৬. *বঙ্গ সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা*, অজিত কুমার ঘোষ, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯, ২০০২, পৃ. ২৪৬
১৭. *সাহিত্য সন্দর্শন*, শ্রীশচন্দ্র দাস, বর্ণ বিচিত্র, ৬৭ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০, ১৯৮৮, পৃ. ১৫৩
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-২৮
২০. *বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য*, সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা-৯, ১৯৯৮, পৃ. ৭৭
২১. *বঙ্কিম রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৩